ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
৫৬ বর্ষ ৩য় সংখ্যা
জানুয়ারি-মার্চ-২০১৭

ইসলামে পরমতসহিষ্ণুতা

টি. ডাব্লিউ. আর্নল্ড

[প্রবন্ধের লেখক প্রফেসর থমাস ওয়াকার আর্নল্ড লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবীর অধ্যাপক। তাঁর অন্যতম গ্রন্থ The Preaching of Islam বিশ্বের সুধী সমাজে সমাদর লাভ করেছে। গ্রন্থখানি ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাংলাভাষায় অনূদিত হয়ে একই শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে) তিনি The Encyclopaedia of Islam-এর অন্যতম সম্পাদক। বর্তমান প্রবন্ধটি ১৯৫৫ সালে নিউইয়র্কের Charles Scribner's Sons কর্তৃক প্রকাশিত ও James Hastings সম্পাদিত The Encyclopaedia of Religion & Ethics-এর Toleration অধ্যায়ে Mohamadanism শিরোনামায় পরিবেশিত তাঁর একটি প্রবন্ধের বাংলা অনুবাদ। প্রবন্ধকার নিজে খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী। মহানবীর নামের সংগে মূল প্রবন্ধে তিনি 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' কথাটি ব্যবহার না করায় অনুবাদেও তা যোগ করা হয়নি। আশা করি, মুসলিম পাঠকেরা রাসূল করীমের (সা) নামের সঙ্গে নিজেরাই এ দরূদটি পাঠ করবেন– সম্পাদক]

ইসলামের সহনশীলতাকে মোটামুটি দু'টি দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা যেতে পারে : (এক) স্বয়ং মুসলমানদের সম্পর্কে সহনশীলতা এবং (দুই) অমুসলমানদের সম্পর্কে সহনশীলতা।

মুসলিম উম্মাহ্‌র পরিসীমার মধ্যে পরমতসহিষ্ণুতার বুনিয়াদ হিসাবে বিবেচনা করা হয় হযরত মুহাম্মদের হাদীস বলে কথিত নিম্নোক্ত বাণী : "ইখ্‌তিলাফু উম্মাতি রাহমাতুন", "আমার উম্মতের মতানৈক্য আশীর্বাদস্বরূপ"। এই মূলনীতি অনুসারেই সুন্নী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ধর্মতত্ত্ববিদ ও ফকিহ্‌দের চারটি মাজহাব : হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী একই সাথে পাশাপাশি অবস্থানের এবং এমনকি তাদের প্রত্যেক মাজহাবের অভ্যন্তরেও ভিন্নমত পোষণের অধিকার সম্ভবপর হয়েছে। এইসব মাজহাবের মধ্যে প্রচুর মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু তা নিয়ে প্রকাশ্য সংঘাতের দৃষ্টান্ত বড় একটা দেখা যায় না। রাসূল (সা)-এর অন্য একটা হাদীসেও সহনশীলতার অনুরূপ ভিত্তি লক্ষ্য করা যায় : "আমার অনুসারীগণ ৭৩ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়বে।" এই হাদীসও মুসলিম সমাজে অসংখ্য ফের্কার উদ্ভবকে অনেকখানি সম্ভব করে তুলেছে। এক সম্প্রদায় কর্তৃক অপর সম্প্রদায়ের নিগ্রহ কখনো কখনো সংঘটিত হয়েছে সত্য, তবে ধর্মীয় মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাই মুসলিম ধর্মীয় ইতিহাসে অধিকতর লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যরূপে পরিগণিত হয়েছে এবং ধর্মবিদগণের একাংশের পরমত-অসহিষ্ণুতাকেও শাসকবর্গ ও জনগণ সাধারণত অন্যায় বলে বিবেচনা করেছেন।[১]

---

১. G. Snouck Hurgronje; 'Le Droit musulman', RHR XXXVII, 174-184; I. Goldziher : Die Zahiriten, Leipzig 1884, P. 94 ff.; Vorlesungen, uber den Islam, Heidelberg 1910, pp. 51_53, 183-185.

ঐশী প্রত্যাদেশ সমৃদ্ধ একাধিক ধর্মমতের স্বীকৃতির মাধ্যমে ইসলাম গোড়া থেকেই অমুসলিমদের প্রতি সহনশীল হওয়ার ধর্মীয় ভিত্তি লাভ করে। মানবজাতির উদ্দেশ্যে নাযিলকৃত যে আদি ধর্ম আদম (আ) থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রেরিত নবী-রাসূলগণ বিভিন্ন যুগে প্রচার করেছেন, কুরআনে ইহুদী ও খৃষ্ট ধর্মমতকে তারই অন্যতম বহিঃপ্রকাশ বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে :

"মানবজাতি মূলে এক ধর্মমতের অনুসারী ছিল; পরে তারা পরস্পর দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে" (সূরা ইউনুস : ২০)। "আদিতে মানবসমাজ এক উম্মত ছিল; অতঃপর আল্লাহ সুসংবাদ প্রদান ও সাবধান-বাণী প্রচারের জন্য নবী প্রেরণ করেন এবং তিনি তাদের সংগে সত্যের বাণীসমৃদ্ধ ঐশীগ্রন্থ প্রেরণ করেন, যেন এই গ্রন্থের সাহায্যে মানবজাতির দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মীমাংসা সম্ভব হয়" (সূরা বাকারা : ২০৯)। ইহুদী ও খৃষ্ট ধর্মযাজকগণ আদিম ধর্মমতের পবিত্রতা বিনষ্ট করায় মুহাম্মদ (সা) 'শেষ নবী' (দ্র. সূরা আহযাব : ৪০) হিসাবে এসেছিলেন আদি ধর্মকেই নূতন করে ঘোষণা করতে।

বিভিন্ন প্রতিযোগী ধর্মমতের অনুসারীদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ভিত্তি হিসাবে কুরআনে নিম্ন মর্মে এক আল্লাহ্‌র স্বীকৃতিকে উপস্থাপিত করা হয়েছে :

"যারা ঐশীগ্রন্থ প্রাপ্ত হয়েছে এবং যারা অজ্ঞ, তাদের উভয়কে বল, তোমরা কি ইসলাম স্বীকার কর? অতঃপর, তারা যদি ইসলামকে স্বীকৃতি দেয়, তবে তারা সৎপথপ্রাপ্ত; কিন্তু তারা যদি মুখ ফিরিয়েও নেয়, তোমার কর্তব্য হবে শুধু প্রচার করে যাওয়া" (সূরা আলে ইমরান : ১৯)। "তাদের (ইহুদী ও খৃষ্টান) পর যারা ঐশীগ্রন্থের উত্তরাধিকার লাভ করেছে, এ সম্পর্কে সন্দেহ তাদের হতভম্ভ করে দিয়েছে। সুতরাং তুমি (তাদেরকে ধর্মবিশ্বাসের প্রতি) আহ্বান জানাও এবং যেমনটি আদিষ্ট হয়েছ তেমনি সম্মুখপানে এগিয়ে যাও। তুমি তাদের খোশখেয়ালের তাবেদারী করো না এবং বল, আল্লাহ যত ঐশী গ্রন্থ প্রেরণ করেছেন তার সবগুলোতেই আমি বিশ্বাস রাখি, আমি তোমাদের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে সবকিছু মীমাংসার জন্য আদিষ্ট হয়েছি, আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক এবং আমাদের প্রতিপালক, আমাদের জন্য আমাদের কর্মফল রয়েছে, তোমাদের জন্য রয়েছে তোমাদের কর্মফল, তোমাদের ও আমাদের মাঝে কোন বিরোধ নেই, আল্লাহ আমাদের সকলকে পুনরায় একত্র করবেন এবং তাঁর নিকটই আমরা সকলে প্রত্যাবর্তন করব" (সূরা শূরা : ১৩-১৪)। "ঐশীগ্রন্থধারীগণের সংগে সদুদ্দেশ্য ব্যতিরেকে এবং যারা (তোমাদের সংগে) অন্যায় ব্যবহার করেছে, তাদের সংগে ব্যতিরেকে বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়ো না। তাদেরকে বল, আমাদের ও তোমাদের নিকট যা নাযিল হয়েছে তৎসমুদয়েই আমরা বিশ্বাস করি। আমাদের ইলাহ ও তোমাদের ইলাহ একজনই এবং তাঁরই উদ্দেশ্যে আমরা আত্মনিবেদিত"। (সূরা আনকাবূত : ৪৫)

ইহুদী ও খৃষ্টান ব্যতীত অন্যান্য ধর্মের প্রতি সহনশীলতার নীতি প্রয়োগের প্রেরণা মুসলিম ধর্মবিদগণ লাভ করেছেন নিম্নোক্ত আয়াত থেকে :

"প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই আমরা তাদের অনুসরণের জন্য ঐশীনির্দেশ প্রেরণ করেছি; সুতরাং তারা যেন তোমার সাথে এ ব্যাপারে তর্কে প্রবৃত্ত না হয়; তুমি তাদেরকে তোমার

রবের পথে আহ্বান কর; তুমি অবশ্যই সঠিক পথপ্রাপ্ত। কিন্তু তারা যদি তোমার সাথে বিতর্কে প্রবৃত্ত হয় তবে বলে দাও : তোমরা কি করছ, তা আল্লাহ সর্বোত্তম জানেন" (সূরা আহযাব : ৬৭-৬৮) "আল্লাহর সংগে যারা শেরেকী করে তাদের কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাকে এজন্য আশ্রয় দান কর যেন সে আল্লাহর বাণী শ্রবণ করতে পারে, তারপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌছিয়ে দাও" (সূরা তাওবা : ৬)। "মুশরিকগণ বলে, 'আল্লাহ যদি চাইতেন আমরা বা আমাদের পূর্ব পুরুষগণ তাঁকে ব্যতীত আর কাউকে উপাসনা করতে পারতাম না। আমরা তো তাঁর অভিরুচির বিরুদ্ধে কোন অবৈধ কাজ করতাম না।' যারা তাদের পূর্বে ছিল তারা এরূপ করেছে। রাসূলদের কর্তব্য তো সহজ-সরল ভাষায় বাণী পৌছে দেয়া" (সূরা নাহল : ৬৫)।

পরমতসহিষ্ণুতার স্পষ্টতম নির্দেশ পাওয়া যায় নিম্নোক্ত আয়াতে :

"ধর্মের বেলায় কোন জোর-জবরদস্তি নেই" (সূরা বাকারা : ২৫৭)।

বলপ্রয়োগে ধর্মান্তর সাধনকে নিম্নোক্ত ভাষায় ঘৃণা করা হয়েছে :

"যদি তোমার রব চাইতেন, পৃথিবীতে যত লোক আছে সকলে এক সঙ্গে ঈমান আনয়ন করত। এরপরও কি তুমি ঈমান আনতে মানুষকে বাধ্য করতে পার? খোদার অনুমতি ব্যতীত ঈমান আনয়ন করতে পারে না" (সূরা তাওবা : ৯৯-১০০; সূরা নূর : ৫৪; সূরা রা'দ : ৪০; সূরা তাগাবুন : ১২)।

কুরআনের বিধানের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রেখেই রচিত হয়েছিল নাজরানের বিশপ, ধর্ম-যাজক ও পাদ্রীদের নিকট প্রেরিত মুহাম্মদ (সা)-এর পত্র; এই পত্রে তাদের গীর্জা, উপাসনা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর পক্ষ থেকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় এবং তারা যতদিন তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলবে, ততদিন তাদের অধিকার সর্বপ্রকার হস্তক্ষেপ থেকে নিরাপদ বলে ঘোষণা করা হয়। মদীনার ইহুদী সম্প্রদায় একটানা শত্রুতা করে বহিষ্কৃত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মুহাম্মদ (সা) তাদেরকে তাদের ধর্ম পালনের অধিকার দান করেছিলেন। হিজরী দশ সালে মু'আজ বিন জাবাল (রা)-কে ইয়েমেন প্রেরণকালে তিনি নির্দেশ দেন, মু'আজ যেন কোনক্রমেই কোন ইহুদীকে স্বধর্ম পরিহারে বাধ্য না করেন।[১]

কুরআনের শিক্ষা ও নবী করীম (সা) আচরিত আদর্শ এমনি করেই খৃষ্ট ও ইহুদী ধর্মমতের প্রতি সহনশীলতার সুস্পষ্ট ভিত্তি রচনা করে যায়। কুরআনে সাবিয়ানদের[২] উল্লেখ থাকায় তাদেরকেও ঐশীগ্রন্থপ্রাপ্ত, অতএব সহনশীলতার হকদার বলে বিবেচনা করা হয়, সম্ভবত হারানিয়ান ও মান্দাইনগণও সহনশীলতার অধিকার লাভের জন্য নিজেদেরকে সাবিয়ান বলে দাবি করেন।[৩] তাদের বর্বর আচার অনুষ্ঠান স্বাভাবিকভাবেই নিষ্ঠাবান

---

১. বালাজুরী : ফুতুহুল বুলদান, ৭১ পৃঃ

২. ২ : ৫৯, ৫ : ৭৩

৩. Al-Nadim, Kitab al Fihrist, ed. G. Flugel, Leipzig 1871-72, 1 : 320

মুসলিমদের ধর্মানুভূতিতে আঘাত করে। কথিত আছে, খলীফা আল-কাহির (৯৩২-৯৩৪ খৃ.) তৎকালীন কাজী আবু সাঈদ আল-ইস্তাখরীর নিকট সাবিয়ানদের আর বরদাশত করা সংগত হবে কিনা এ সম্পর্কে অভিমত প্রার্থনা করেন। তাঁকে বলা হয়, যেহেতু তারা খৃষ্টান বা ইহুদী কিছুই নয়, বরং তারা যখন গ্রহ-নক্ষত্রের উপাসনা করে, তাদের উৎখাত করে দেওয়াই শ্রেয়। খলীফা অবশ্য এদেরকে দূরদেশে গিয়ে বসবাসের অনুমতি দেন এবং উক্ত বিশিষ্ট ধর্মবিদের ফাতাওয়া অগ্রাহ্য করেন।[২]

প্রায় চল্লিশ বছর পর তাঁর উত্তরপুরুষ তায়িলি-আমরিল্লাহ সাবিয়ানদের পক্ষে এক নয়া উদারনৈতিক ফরমান জারী করেন। এতে তিনি তাদের নিজেদের, তাদের পরিবার ও সম্পত্তির নিরাপত্তা এবং তাদের মন্দির ও উপাসনালয়ে গমনের অবাধ অধিকার এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করেন।[৩] ১২৩০ খৃ. অবধি তাদের সর্বশেষ মন্দির অক্ষত অবস্থায় দণ্ডায়মান ছিল। উল্লিখিত বছরে এই মন্দির বর্বর মোঙ্গল বাহিনী কর্তৃক বিধ্বস্ত হয়।[৩]

যেসব ধর্ম সম্পর্কে কুরআনে উল্লেখ নেই, অথচ দ্রুতপ্রসারণশীল মুসলিম সাম্রাজ্যে যাদের অনুসারী ছিল বিপুল সংখ্যক, সেসব ধর্মের প্রতিও অনুরূপ সহনশীলতার মনোভাব প্রসারিত করবার পশ্চাতে কাজ করেছিল রাজনৈতিক উপযোগবাদ এবং ধর্মীয় আইনের স্বীকৃত প্রথার সাথে সামঞ্জস্য বিধানে হিজরী দ্বিতীয় শতকের ফকিহ্‌দের আগ্রহ। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যখন পারস্যদেশে আরব শাসন প্রসার লাভ করে তখন বলা হয়, মুহাম্মদ জোরোস্ত্রীয়গণের প্রতি আহ্‌লে কিতাবদের অনুরূপ ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৪]

আব্বাসী সালতানাতের পতন পর্যন্ত জোরেস্ত্রীয়গণ তাদের আচার-অনুষ্ঠান পালনে খুব কমই বিপত্তির সম্মুখীন হয়।[৫] জনৈক মুসলিম সেনাপতি (মু'তাসিমের রাজত্বকালে ৮৩৩-৮৪২খৃ.) সম্পর্কে এমনও এক বিবরণী পাওয়া যায় যে, তিনি সুনদে একটি অগ্নি-উপাসনালয় ভেঙে তদস্থলে মসজিদ নির্মাণে অভিযোগে ইমাম ও মুয়াজ্জিনকে বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করেন। পারস্য বিজয়ের তিন শত বছর পর দশ শতকেও প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই অগ্নি-উপাসনালয় পরিদৃষ্ট হতো।[৬]

এমন কি, যে মেনেকীয়গণ মুসলিম আইনে সহনশীলতার হকদার ছিল না, তারাও দশম শতাব্দীর পূর্ব অবধি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় হিসাবে তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। খলীফা মামুনের রাজত্বকালে তাদের নেতা ইয়াজদানবখ্‌ত বাগদাদে মুসলিম ধর্মবিদদের সংগে এক প্রকাশ্য বাহাছে অংশগ্রহণ করেন।[৭]

---

২. Al-Nawawi, Biographical Dictionary, ed. F. Wustenfeld, Gottingen 1842-47, p. 725.
৩. Chwolsohn: Die Ssabier und der Ssabismus, II: 537 f.
৪. Ib. I: 232.
৫. বলাজুরি: পৃঃ ৭১, ৭৯, ৮০
৬. D. Menant, Les Zoroastrians de Perse, RMM III (1907) 212.
৭. Masudi, Les Prares d'=Or, Paris, 1816_77, IV: 86.
৭. আল-বাগদাদি, ৩৩৮ পৃঃ

কুরআনে পৌত্তলিকতার কঠোর নিন্দাবাদ থাকায় (দ্র. সূরা নিসা : ১১৬; ১১৯; সূরা আম্বিয়া : ৯৮-১০০) মুসলিম শাসকদের পক্ষে প্রতিমাপূজকদের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন প্রায় অসম্ভব বলেই মনে হয়। এতদসত্ত্বেও হারুনের রাজত্বকালে মুসলিম আইন পৌত্তলিক তথা মূর্তি, অগ্নি ও প্রস্তর পূজকদিগকে জিজিয়া প্রদানের অধিকার দিয়ে সেগুলোকেও অনুমোদিত ধর্মমতের তালিকাভুক্ত করে।[১] খলীফা উসমান প্রকৃতিপূজক নারবারদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে জোরোস্ত্রীয়গণের সম্পর্কে অনলম্বিত উমরের নীতি অনুসরণ করেন এবং তাদেরকে জিজিয়া প্রদানের অনুমতি দান করেন।[২] ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণগণও মুসলিম শাসনের শুরু থেকেই জিজিয়া প্রদান করে[৩] এবং তাদের ধর্মাচরণের অধিকার বজায় থাকে বলে মনে হয়, তবে নতুন মন্দির নির্মাণ অবৈধ বলে গণ্য করা হতো।[৪] যদিও পরবর্তী মুসলিম অভিযানকালে কখনো কখনো হিন্দু-মন্দির বিনষ্ট করা হয়, তবুও প্রতিষ্ঠিত মুসলিম সরকারসমূহ পূর্ববর্তী হিন্দু শাসকদের ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন বলেই মনে হয়। ভারতে মুসলিম শাসনের সূত্রপাত হয় সিন্ধুতে। সেখানেও এই সত্যের নজীর মেলে। এর অনেক দিন পর ষোল শতকে বাংলার তদানিন্তন মুসলিম সরকার নাকি উড়িষ্যার জগন্নাথ-পূজার আয়োজন করে বার্ষিক দশ লক্ষ টাকা রাজস্ব সংগ্রহ করতেন[৫] এবং যে হায়দার আলী ও টিপু সুলতানকে হিন্দু প্রজাপীড়নের জন্য অভিযুক্ত করা হয়, তারাও দক্ষিণ-ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান শ্রীঙ্গেরী মঠের জন্য অর্থসাহায্য প্রদান করেন।[৬] অদ্যাবধি ভারতের মুসলিম-শাসিত দেশীয় রাজ্যসমূহে এই নীতি অনুসৃত হয়। হায়দরাবাদ ও বাহওয়ালপুরে এখনও হিন্দু-মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্বতন্ত্রভাবে অর্থ বরাদ্দ করা হয়।[৭]

এমন কি, বেলুচিস্তানের মত পশ্চাৎপদ অঞ্চলেও হিন্দুরা তাদের জিজিয়া প্রদানের তুলনায় অনেক বেশী উদার অধিকার ভোগ করে। নিগ্রহ ও নির্যাতন থেকে তারা মুক্ত; উপজাতীয় লোকদের সাথে বিবাদ-বিসম্বাদ হলে তারা তাদের সর্দারের নিকট সম্মানজনক বিচার ও ফায়সালার আবেদন জানাতে পারে; তাদের নারীদের ইজ্জত পূর্ণ মর্যাদা লাভ করে থাকে; তাদের ধর্মকে দেওয়া হয় পূর্ণ নিরাপত্তা; তাদের পর্ব-প্রথায় কেউই বিপত্তি সৃষ্টি করতে পারে না।[৮]

মুসলিম সরকারের অধীনে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিককে বলা হতো 'জিম্মী' (অভিধানগত অর্থে : যার সংগে কোন চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে), এবং মুসলিম

---

১. আবু ইউসুফ : কিতাবুল খারাজ, ৭৩ পৃঃ
২. বালাজুরী ৮০ পৃঃ
৩. Elliot, The History of India. I : 176, 476.
৪. Ib. III : 380.
৫. W W. Hunter : A Statistical Account of Bengal, XVII (London 1877) p. 190
৬. Annual Report of the Mysore Archeological Deptt. for the year 1916, Bangalore 1917 pp. 73-75.
৭. M.A. Macauliffe, the Sikh Religion, Oxford 1909.
৮. Census of India. 1911, vol. IV (Calcutta, 1913), Baluchistan, pt. I p. 175.

বিজেতাগণ বিভিন্ন শহর ও জনপদে তাদের অধিকার বিস্তারকালে যেসব চুক্তিপত্র সম্পাদন করতেন তার শর্তানুসারেই তাদের বসবাস করতে হতো। ১৭ হিজরী ৬৩৮ খৃষ্টাব্দে যখন জেরুজালেম মুসলিম অধিকারে আসে, তখনকার সম্পাদিত শর্তাবলী উদ্ধৃত করে উদ্বিগিত চুক্তির দৃষ্টান্ত পেশ করা যেতে পারে :

"পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি। আল্লাহর বান্দা বিশ্বাসীদের নেতা উমরের পক্ষ থেকে ঈলিয়ার জনসাধারণের প্রতি নিম্নরূপ নিরাপত্তার জিম্মা প্রদান করা হচ্ছে। পীড়িত-সুস্থ নির্বিশেষে সকল মানুষকে তিনি জীবন, সম্পত্তি, গীর্জা ও ক্রুশসমূহ এবং ধর্ম সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের নিরাপত্তা প্রদান করছেন। তাদের উপাসনালয় বাসস্থানে পরিণত করা হবে না, ধ্বংস করা হবে না, অথবা সেসব বা সেসবের কোন আসবাবপত্র বিনষ্ট করা হবে না। বাসিন্দাদের ক্রুশের কোন ক্ষতি করা হবে না। ধর্মবিশ্বাসের ব্যাপারে তাদের পথে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হবে না, অথবা তাদের কাউকে কোন ক্ষতি করা হবে না।"[১]

এর পেছনে মূলনীতি এই ছিল যে, জিম্মী তার প্রদত্ত অর্থের পরিবর্তে এবং সদাচরণের বিবেচনায় মুসলিম সরকারের তরফ থেকে রক্ষণাবেক্ষণ এবং জীবন, সম্পত্তি ও ধর্মের নিরাপত্তার অধিকার ভোগ করবে। এই শর্তের প্রতি অশ্রদ্ধা পোষণকারীদের উদ্দেশে রাসূল (সা)-এর হাদীসে নিম্নোক্ত সাবধানবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে : "জিম্মীর প্রতি যে ব্যক্তি জুলুম করবে এবং তাকে তার সাধ্যাতিরিক্ত বোঝা বহনে বাধ্য করবে, আমি তার বিরুদ্ধে করিয়াদী হব।"[২] "যে ব্যক্তি জিম্মীর উপর নির্যাতন চালায়, সে যেন আমার উপর নির্যাতন চালায়।"[৩] তাদের প্রতি অনুরূপ মনোভংগীর পরিচয় আমরা উত্তরসূরিদের প্রতি খলীফা উমরের নসিহত থেকেও পাই : "আমি আল্লাহ্‌র রাসূলের জিম্মীদের তোমাদের জিম্মায় রেখে যাচ্ছি। লক্ষ্য রেখ, যেন তাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি যথাযথ পালিত হয় এবং তাদেরকে দুশমনের হামলা থেকে রক্ষা করা হয় এবং তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত কোন বোঝা যেন তাদের উপর চাপানো না হয়।"[৪] একইরূপে আলী (রা) যখন ৩৬ হিজরীতে (৬৫৬ খৃ.) মুহাম্মদ বিন আবু বকরকে মিসরের গবর্নর নিযুক্ত করেন, তিনি জিম্মীদের প্রতি সুবিচার করার নির্দেশ দান করেন।[৫] অনুরূপভাবে তুর্কী আইন-গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, জিম্মীদের ধর্মাচরণে কোনরূপ বাধা প্রদান করা হবে না।[৬]

স্থানীয় পরিস্থিতি ও স্থানীয় সরকারের প্রকৃতিভেদে এসব নীতির বাস্তব প্রয়োগে কিছু কিছু পার্থক্য দেখা দেয় এবং হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে জিম্মী সংক্রান্ত আইন যখন বিধিবদ্ধ

---

১. তাবারী- ১ : ২৪০৫
২. Balajori p. 112; Yahya Bu Kitab al Kharaj. Leyden 1896, p. 54.
৩. Al Makin, Historia Saracenica. Leyden 1625, p. 11.
৪. আবু ইউসুফ-৭২, কিতাবুল খারাজ, পৃ.
৫. তাবারী ১ : ৩২৪৭; অনুরূপ, মাকিন বিন কাতেবের প্রতি তাঁর নসিহত ১ : ৩৪৩০
৬. M. d' Ohsson, Tablean general de l'empire otboman, Paris 1820, III. 44.

করা হয়, পূর্বের তুলনায় অধিকতর কঠোর ও অসহনশীল নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। কিন্তু হিজরী সালের প্রথম একশত বৎসর পর্যন্ত খৃষ্টীয় চার্চ ধর্মীয় জীবনে এমন সুষ্ঠু সহনশীলতা ও স্বাধীনতার অধিকার ভোগ করত, বাইজান্টাইন সরকারের শাসনে কয়েক যুগ ধরে যা ছিল সম্পূর্ণ অকল্পনীয় ব্যাপার। এর সমসাময়িক প্রমাণ আমরা পাই পারস্যের প্রাইমেটের (Primate) নিকট প্রেরিত নেস্তোরীয় শাসক তৃতীয় ইশোয়াবের (৩০-৪০ হি./৬৫০-৬৬০খৃ.) পত্র থেকে :

"আরবদেরকে আল্লাহ বর্তমান যুগে দুনিয়ার রাজত্ব দান করেছেন। তোমরা নিশ্চয়ই জান, তারা তোমাদের মধ্যেই আছে, অথচ তারা খৃষ্টীয় ধর্মের প্রতি কোন হামলা চালায় না, বরং তারা আমাদের ধর্মের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করে, আমাদের পাদ্রী ও ধর্মগুরুদের শ্রদ্ধা করে এবং বিভিন্ন গীর্জা ও মঠে সাহায্য প্রদান করে।"[১]

প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় আচার-আয়োজনের ভারপ্রাপ্ত এই চার্চ মুসলিম শাসনাধীনে প্রভূত বিস্তৃতি লাভ করে। পারস্য থেকে চীন ও ভারতে মিশনারী প্রেরিত হয়; প্রায় একই সময়ে নেস্তোরীয়গণ মিসরে প্রভাব বিস্তার করে এবং পরবর্তীকালে এশিয়ার বিভিন্ন এলাকায় খৃষ্টীয় ধর্মমত প্রচার করতে থাকে এবং এগারো শতকের দিকে তাতারদের মধ্য থেকে অনেককে ধর্মান্তরিত করে।[২]

হিজরী দুই শতকে খৃষ্টানদের অবস্থা কম সহনশীল হয়ে ওঠে। সিরিয়া ও পারস্যে যে বিজয়ী বাহিনী আরব শাসন কায়েম করে তারা ধর্মীয় ভেদ-বুদ্ধি দ্বারা খুব কমই প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং উমাইয়াদের শাসনকালে খৃষ্টান ও অন্যান্য অমুসলিম সম্প্রদায়কে রাজস্বের পরিপ্রেক্ষিত ব্যতিরেকে অন্য কোনরূপে বিবেচনা করা হয়নি। কিন্তু আব্বাসী আমলে সরকারী দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সূচিত হয়। যে গোঁড়া প্রতিক্রিয়া-শক্তি এই রাজবংশকে সমর্থন করত এবং ধর্মীয় ও পার্থিব বিষয়ের যে সম্মিলন এই বংশের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছিল, তাদের দৌরাত্ম্যে চলতি আইনের প্রয়োগ অধিকতর অত্যাচারমূলক রূপ পরিগ্রহ করে। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সংগে সুদীর্ঘ সংগ্রাম পরিচালনাকালে খৃষ্টান প্রজাদের রাষ্ট্রানুগত্য সম্পর্কে খলীফাদের সন্দেহ উদ্রেকের প্রচুর অবকাশ ঘটে এবং সম্রাট নিকো-ফারাসের বিশ্বাসঘাতকতা হারুনুর-রশীদ (১৫১-১৯৪হি./৭৬৮-৮০৯খৃ.) কর্তৃক অবলম্বিত কঠোর মনোভাবের অন্যতম কারণ হওয়াটা মোটেও বিচিত্র নয়। হারুন খৃষ্টানদের স্বতন্ত্র পোশাক পরিধান এবং সমস্ত সরকারী পদ থেকে মুসলমানদের পক্ষে ইস্তফা দানের নির্দেশ দেন। তবে সরকারী কর্মপন্থার তুলনায় ধর্মশাস্ত্রবিদ ও গোঁড়া আলেমদের ফাতাওয়া প্রায়শই অধিকতর অসহনশীল হতো এবং অমুসলিম নাগরিকদের প্রতি প্রদর্শিত ব্যবহার সব সময় যে ঠিক এসব ফাতাওয়ার পরিসীমা মেনে চলত, এমন মনে করাও খুব সংগত হবে না। হারুনের আমলের বিখ্যাত শাস্ত্রবিদ ইমাম আবু ইউসুফ (র) রিদ্দা (রাসূলের মৃত্যুর পর যারা ইসলাম আনুগত্য স্বীকার করে) এবং পৌত্তলিক আরবদের জন্য ইসলাম গ্রহণ অথবা

---

১. J. S. Assemani : Bibliotheca Orientalis, Rome 1917-28, vol. III, p. I, p. 131.

২. J. Labourt : De Timotheo I, Nestorianorum Patriarcha Paris, 1904, p. 37 ff.

মৃত্যুবরণ ব্যতীত অন্য বিকল্পের অধিকার দিতে অস্বীকার করেন। অথচ কায়তানী[১] প্রমাণ করেছেন যে, প্রথম যুগের নিজেতাগণ এরূপ কোন নীতি চাপিয়ে দিতে পারতেন না এবং ঐতিহাসিক তথ্যাবলী থেকে এরকম বিকল্প ব্যবস্থা অতীতে কখনও বিধর্মী আরববাসীর উপর চাপানো হয়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না।

তবে জিম্মীদের প্রতি নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বয়ং মুসলিম শাস্ত্রবিদগণের গ্রন্থেও কম নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ আবু ইউসুফ[২] (র) জিম্মীদের প্রতি সহৃদয় ব্যবহারের দাবি জানিয়েছেন। জিয্য়া প্রদানের জন্য উপস্থিত হলে তাদের প্রহার করা অথবা রৌদ্রের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রাখা অথবা কোন নির্যাতন করা চলবে না। খলীফা হারুনের নিকট তিনি তাদের পক্ষ হয়ে আবেদন জানান :

"আমিরুল মুমিনীনের (আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করুন) জন্য এটা অবশ্য কর্তব্য যে, আপনার রাসূল এবং পূর্বপুরুষ মুহাম্মদ (তাঁর উপর আল্লাহ্‌র সালাম ও শান্তি বর্ষিত হোক) যাদের সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তাদের প্রতি যেন আপনি সদয় ব্যবহার করেন, তাদের প্রতি যেন কোন অন্যায় বা দুর্ব্যবহার করা না হয়, অথবা তাদের সাধ্যাতিরিক্ত (আর্থিক) বোঝা যেন তাদের উপরে চাপানো না হয়, অথবা দেয় পরিমাণের অধিক কোন সম্পত্তি যেন তাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেওয়া না হয়। কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, 'জিম্মীর প্রতি যে ব্যক্তি অত্যাচার করবে অথবা তার উপর তার সাধ্যাতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেবে, কিয়ামতের দিন আমি তার বিরুদ্ধে ফরিয়াদী হব।"[৩]

ইব্‌নুল কাসিম আল-নাজীর (৯১৮ হি./১৫১২ খৃ. মৃত্যু) অভিমত এই যে, অধিকাংশ মুসলিম আইনবিদের মতে জিম্মীগণ যখন জিয্য়া প্রদান করতে উপস্থিত হয়, তখন তাদের প্রতি ক্রোধ নয়, বরং সহৃদয়তা ও বিবেচনার সহিত ব্যবহার করতে হবে।[৪] প্রায় দুই শতাব্দী পর এ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে আল-চিরমাভী (১৬৯৪ মৃত্যু) কুরআনের (৯ : ২৯) সেইসব গোঁড়া টীকার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তোলেন যেগুলো 'উৎপীড়ন' অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।[৫] তাঁর মতে, 'অনুগত হওয়া' অর্থ ইসলামের জিম্মী সংক্রান্ত আইনের অনুগত হওয়া এবং রাজস্ব সংগ্রাহকের সম্মুখে অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান হতে বাধ্য করা; তার মুখে চপেটাঘাত করা বা দাড়ি ধরে টানা প্রভৃতি যেসব অত্যাচার জিয্য়া প্রদানের কালে জিম্মীদের উপর কখনো কখনো করা হয়েছে তা অসংগত কারণ (তিনি ঠিকই বলেছেন) এমন কোন প্রমাণ নেই যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বা তাঁর কোন খলীফা কস্মিনকালেও এ ধরনের কোন আচরণ করেছেন।[৬]

---

১. ২ : ৮২৯, ৫ : ৩৩৭

২. কিতাবুল খারাজ, ৭০ পৃঃ

৩. কিতাবুল খারাজ, ৭১ পৃঃ

৪. Fath al-Qarib, ed. L.W.C. Van den Berg, Leyden 1894, p. 625 f.

৫. 'Persecution' Encylopaedia of Religion and Ettics.

৬. ইশিয়া আলা শার ইব্‌ন কাশিম আল-গাজী, কায়েরো ১৮৭৯, ৩২৬ পৃঃ

মুসলিম ইতিহাসের এমন এক পর্যায়ে, যখন খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে প্রচুর বিক্ষোভ সঞ্চিত হচ্ছিল এবং যখন মুসলিম সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা শুরু হওয়ায় তাদের অবস্থা অধিকতর সঙ্গীন হয়ে পড়েছিল এবং তাদের উপর স্থানীয় কর্মচারীদের উৎপীড়ন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেই সময় মুসলিম আধ্যাত্মবাদীদের সাধন-তরিকাসমূহ, বিশেষ করে কাদেরীয়া তরিকার বিস্তৃতি এবং মুসলিম মরমী চিন্তাধারার জনপ্রিয়তা সহনশীলতার পরিবেশ সৃষ্টিতে বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। মোঙ্গল ধ্বংসাভিযানের পর মুসলিম ধর্মসাধকগণ এই মরমী সূফীবাদের মধ্যেই সান্ত্বনা খুঁজে পাচ্ছিলেন। কাদেরিয়া তরিকার প্রতিষ্ঠাতা আবদুল কাদের জিলানী (৫৫৭ হি./১১৬১খৃ. মৃত্যু) দানশীলতা ও বিনয়-চর্চার উপর খুব জোর দিতেন এবং খৃষ্টানদের প্রতি তাঁর ও তাঁর শিষ্যদের মনোভাব সহৃদয় ও সহানুভূতিশীল ছিল।[১]

ইরানী সূফীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল ধর্মীয় পার্থক্যের প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ না করা এবং এই সূফী আন্দোলনের প্রভাবে যেসব কবি কাব্যচর্চা করেন তারা প্রায়ই সহনশীলতার উপর জোর দিতেন। শেখ সাদীর বুস্তা কাব্যগ্রন্থে[২] উল্লিখিত ইব্রাহিম (আ)-এর গল্প এ ব্যাপারে সুপরিচিত দৃষ্টান্ত। এই কাহিনীতে আল্লাহ জনৈক বৃদ্ধ অগ্নিপূজককে বিধর্মিতার কারণে ভিক্ষা না দেওয়ায় গৃহস্থকে ধিক্কার দিয়েছেন। আইনের কঠোরতা সত্ত্বেও সহনশীলতার যেসব বাস্তব দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হয়েছে, এখানে সেসবের উল্লেখ সংগতভাবেই করা চলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদিও উমর তথাকথিত চুক্তিতে নতুন নতুন গীর্জা নির্মাণ নিষিদ্ধ ছিল, তবুও এসম্বন্ধে মুসলিম শাস্ত্রবিদদের মধ্যে বেশ মতানৈক্য ছিল।

উদার হানাফী মতবাদে মনে করা হতো, মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় নতুন গীর্জা ও সিনাগগ নির্মাণ অবাঞ্ছনীয় হলেও পুরাতন উপাসনালয় বিধ্বস্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার সংস্কারসাধন অন্যায় হবে না এবং যেসব গ্রামে ইসলামের প্রভাব ক্ষীণ, সেসব স্থানে অমুসলিমদের জন্য নতুন উপাসনালয় নির্মাণও চলতে পারে। গোঁড়া হাম্বলী মাযহাবে মনে করা হতো, এগুলো নতুনভাবে নির্মাণের তো প্রশ্নই ওঠে না, এমন কি পুরাতন উপাসনালয়ের সংস্কারও চলতে পারে না। কতক শাস্ত্রবিদ মনে করতেন, এই অধিকার চুক্তির শর্ত অনুসারে পৃথক হবে। কোন শহর বলপ্রয়োগে বিজিত হলে সেখানে জিম্মীদের নয়া উপাসনালয় নির্মাণ চলবে না, তবে যদি কোন শহর চুক্তির মাধ্যমে মুসলিম দখলে আসে, নতুন গীর্জা বা সিনাগগ নির্মাণ বৈধ হবে। তবুও মুসলিম শাস্ত্রবিদদের অন্যান্য বহু ফাতাওয়ার ন্যায় এটার সাথেও বাস্তবতার খুব কমই সম্পর্ক ছিল। খাতায় কলমে হয়ত দেখা যাবে, জিম্মীগণ কোন মুসলিম অধ্যুষিত নগরীতে উপাসনালয় নির্মাণ করতে পারত না; কিন্তু বেসামরিক কর্তৃপক্ষ নয়া রাজধানী কায়রোতে কপ্টি খৃস্টানদেরকে গীর্জা নির্মাণের অনুমতি দিয়েছিলেন।

---

১. T.W. Arnold : The Preaching of Islam, p. 329.

২. II : 37-54, ed. G. H. Graf, Vienna 1858, p. 142 f.

উমর বিন আবদুল আজিজ (৯৯-১০২ হি. ৭১৭-৭২০ খৃ.) যে সমস্ত নবনির্মিত গীর্জা ধ্বংসের আদেশ দিয়েছিলেন এবং অসহিষ্ণু আল-মুতাওয়াক্কিলকেও (৮৪৭-৮৬১ খৃ.) যে এক শতাব্দীরও অধিককাল পর একই নির্দেশের পুনরাবৃত্তি করতে হয়েছিল, তাতেই প্রমাণ হয় যে, নতুন গীর্জা নির্মাণের উপর নিষেধাজ্ঞা কতখানি কার্যকরী করা হতো; এবং খৃষ্টান ও মুসলিম উভয় ঐতিহাসিক গোষ্ঠীই নতুন গীর্জা নির্মাণের অসংখ্য দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন এবং এর অনেকগুলোই ছিল প্রাসাদোপম সুরম্য অট্টালিকা।[১] ফিলিস্তিনের রামলায় অবস্থিত কয়েকটি গীর্জা দাঙ্গাকালে মুসলমানগণ বিনষ্ট করায় আল-মুকতাদির (৯০৮-৯৩২) স্বয়ং সেগুলো পুনর্নির্মাণের হুকুম দেন।[২] ইসলাম ধর্মত্যাগের জন্য মুসলিম আইনে মৃত্যুদণ্ডের বিধান রয়েছে এবং ইসলাম গ্রহণকারীকে তার পূর্বধর্মে ফিরে যাবার কোন অধিকার দেওয়া হয় না, কিন্তু অনুরূপ ক্ষেত্রেও বিবেকের স্বাধীনতা দানের মহত্তর দৃষ্টান্ত সাধারণত অধিক দেখা যায় না।

এমন কি, যে উগ্রমস্তিষ্ক হাকিমের (৯৯৬-১০২০) অত্যাচারে অনেক ইহুদী ও খৃষ্টান স্বধর্ম পরিত্যাগ করেছিল, তিনিও ধ্বংসপ্রাপ্ত গীর্জাসমূহ পুনর্নির্মাণের হুকুম দিয়েছিলেন এবং গীর্জার সাথে জড়িত সম্পত্তি তার অধিকারীদের নিকট ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং অনিচ্ছুক ধর্মান্তরিতদের তাদের পূর্বধর্মে ফিরে যাবার অনুমতি দিয়েছিলেন।[৩] একাধিক লেখকের বর্ণনায় পাওয়া যায়, স্পেনের আল-মুওয়াহহিদ বংশের অসহিষ্ণু শাসনাধীনে মূসা মায়মুনী ইসলাম গ্রহণ করবার পর মিসরে পলায়ন করেন এবং সেখানে নিজেকে প্রকাশ্যে ইহুদী বলে ঘোষণা করেন। তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে স্পেনের জনৈক মুসলিম শাস্ত্রবিদ তাঁকে ধর্মত্যাগী বলে অভিযুক্ত করেন এবং এই অপরাধের জন্য তার কঠোরতম শাস্তি দাবি করেন। কিন্তু আল-কাজী আল-ফাদিল আবদুর রহিম বিন আলী (অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুসলিম কাজী ও সালাহুদ্দীনের প্রধানমন্ত্রী) এতে বাধা প্রদান করেন। তিনি যুক্তি ও দলিল দিয়ে প্রমাণ করেন যে, যে ব্যক্তিকে বলপ্রয়োগে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হয়েছে তাকে মুসলিম বলা যায় না।[৪] ইসলাম সম্পর্কে ঈর্ষাপরায়ণ ইহুদী লেখকগণ এই ঘটনার যথার্থতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন, যদিও এর প্রথম বর্ণনাকারী ইবনুল কিফতী মায়মুনীর সমসাময়িক লোক ছিলেন।[৫] মুসলিম সহনশীলতার কথা চিন্তা করতে গেলে এও লক্ষণীয় যে, কাজী আল-ফাদিলের ফতয়া সম্বন্ধে এ পর্যন্ত কোন মতানৈক্য বা আপত্তি দেখা যায় নি। ঠিক অনুরূপ, পারস্যের খান নাজান (১২৯৫-১৩০৪) যখন বুঝতে পারেন যে, তার রাজত্বের প্রথমদিকে যেসব বৌদ্ধ সাধু ইসলাম গ্রহণ করে (যখন তাদের মন্দির ভেঙ্গে দেওয়া হয়), তারা আসলে শুধু ধর্মান্তরিত হবার ভান করেছিল, তিনি তাদের মধ্যে যাদের ইচ্ছা তিব্বতে ফিরে গিয়ে

---

১. Arnold : The Preaching of Islam, pp. 66-68

২. Eutychius, Annales, ed. L. Cheikho, Paris, 1906-09, II : 82.

৩. Ibn Khallikan, Biographical Dictionary, tr. Macguckin de Slane, Paris, 1843-71, III, 451.

৪. Ibn al-Qufti, Tarikhul-Hukama, ed. G. Lippert, Leipzig, 1903, p. 318, line 5, p. 319, lines 16-19 etc.

৫. A. Barliner : Zur Ehreurettung des Maimonides, in Moses ben Maimon, etc.

অনুকূল পরিবেশে পুনরায় তাদের স্বধর্ম পালনের অনুমতি দেন। জে. বি. টেভারনিয়ারও ইস্পাহানের কতক ইহুদী সম্বন্ধে অনুরূপ ঘটনার উল্লেখ করেছেন। এরা স্থানীয় শাসনকর্তা কর্তৃক এত বেশি অত্যাচারিত হয়েছিল যে, শক্তি বা চতুরতা প্রয়োগ করে তিনি তাদেরকে মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত করেন। কিন্তু সুলতান (দ্বিতীয় শাহ্ আব্বাস ১৬৪২-১৬৬৭) যখন বুঝতে পারলেন যে, শুধু বল ও ভীতি প্রদর্শনের দ্বারাই এটা সম্ভব হয়েছে, তিনি তাদের স্বধর্মে প্রত্যাবর্তন করে শান্তিতে বসবাসের অনুমতি দেন। ১৮৪৪ সালে নসর খান বেগের উৎপীড়নমূলক শাসনামলে ইয়াজিদী-খৃস্টানগণ ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়, কিন্তু তিন বছর পর এক শাহী ফরমানে তাদেরকে স্বীয় ধর্মমতে ফিরে যাবার অনুমতি দেওয়া হয়।[২]

মুসলিম সরকারসমূহের অবলম্বিত পন্থা থেকে স্বভাবতই প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক জিম্মী সম্প্রদায়কে তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ এবং বিবাহ, উত্তরাধিকার প্রভৃতি বিষয়, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে ফৌজদারী বিষয় ও সংশ্লিষ্ট ধর্মনেতাদের মারফত ফায়সালার অধিকার দেওয়া হতো।[৩] অবশ্য ইমাম আবু হানীফার মতে কোন মুসলিম সরকার বা সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের উপর এসব বিচারকের রায় গ্রহণ বাধ্যতামূলক হতে পারে না।[৪] এইসব রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করা হলে মুসলিম বিচারক কুরআন ও মুসলিম আইন অনুসারেই বিচার করবেন। কোন কোন আইনবিদ রাষ্ট্র কর্তৃক উত্তরাধিকার বিষয়ে মুসলিম আইন প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন। কারণ তাতে জিম্মীদের আইনের তুলনায় রাষ্ট্রীয় কোষাগার অধিকতর লাভবান হতো। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগের মিসরের বিচারক খায়ের বিন নুয়ায়েমের বিবরণী থেকে জানা যায়, তিনি মসজিদের অভ্যন্তরে মুসলমানদের অভিযোগাদি শুনানীর পর মসজিদের বাইরের সিঁড়িতে বসে ইহুদী ও খৃষ্টানদের মামলা শ্রবণ করতেন। এমনি করে তিনি তাদের স্বধর্মাবলম্বীদের মধ্যে তাদের সাক্ষ্যের মূল্য পরীক্ষা করে দেখতেন।[৫]

মুসলিম শাসনে উদারতার একটি মূল্যবান প্রমাণ এই যে, নির্যাতিত খৃষ্টান ও অন্যান্য ধর্ম-সম্প্রদায় তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অবাধ স্বাধীনতা ভোগের উদ্দেশ্যে প্রায়শই মুসলিম জনপদে আশ্রয় গ্রহণ করত। ৭১৪ সালে বাইজান্টাইন সম্রাট লিউ যখন মোনোফিস্ট ও ইহুদীদেরকে খৃষ্টধর্ম গ্রহণে বাধ্য করেন, তাদের কেউ কেউ ধর্মীয় স্বাধীনতা হারিয়ে বেঁচে থাকার পরিবর্তে অগ্নিদগ্ধ হয়ে আত্মাহুতি দেয় এবং অন্য সকলে নিরাপত্তার জন্য পার্শ্ববর্তী আরব রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে।[৬] সপ্তদশ শতাব্দীর শেষদিকে অত্যাচারিত স্পেনীয় ইহুদীগণ বিপুল সংখ্যায় তুরস্কে আশ্রয় গ্রহণ করে।[৭] হাংগেরী ও ট্রানসিলভিনিয়ার ক্যালভিনিষ্টগণ এবং

---

১. Six Voyages through tartary into Persia and the East Indies, Eng. tr, London, 1677, p. 166
২. G. P. Badger : The Nestorians and Their Rituals, London, 1852. I : 133 f.
৩. Arnold, p. 146.
৪. Mawardi : Constitutiones Politicae, ed. Ma. Enger, Bonn, 1853, P. 108 f.
৫. Al-kindi : Kitab al-Qudah, ed. R. Guest, London, 1912, p. 351.
৬. Michael the Elder : II : 489-490. Theophanes : Chronographia (PG cVIII 810, 812)
৭. La Jonquiere : Hist. de l'empire ottomian, new ed. II : 501.

শেষোক্ত দেশের ইউনিটারিয়ানগণ হ্যাম্পবার্গের উগ্র রাষ্ট্রের কবলে পতিত হবার পরিবর্তে তুর্কীদের নিকট আত্মসমর্পণ করা অধিকতর কাম্য মনে করত।[১] সপ্তদশ শতাব্দীর সাইলেসিয়ার প্রটেষ্ট্যান্টিগণ আকুল নয়নে তুরস্কের দিকে তাকিয়ে থাকত এবং এমন কি, মুসলিম শাসনের নিকট আত্মসমর্পণের মূল্যে তারা নানন্দে ধর্মীয় স্বাধীনতা ক্রয়ে রাজী ছিল।[২] আদিম খৃষ্টীয় মতবাদে বিশ্বাসী কসাকগণের উপর রাশিয়ান রাষ্ট্রীয় চার্চ ১৭৩৬ সালে অমানুষিক নিপীড়ন চালায়। সেখানে মুসলিম সালতানাত কায়েম হওয়ার পর তারা এমন উদার সহনশীলতা লাভ করে, যা পূর্বে তাদের খৃষ্টান স্বজাতি ভাইদের নিকট থেকেও তারা পায়নি।[৩]

মুসলিম জগতে পরমতসহিষ্ণুতা সম্বন্ধে সাধারণভাবে এটা বলা যায় যে, খিলাফতের পতন-যুগে বা মোঙ্গল আক্রমণের অশুভ জমানায় অথবা যেসময় খৃষ্টীয় রাষ্ট্রসমূহ নির্মমভাবে মুসলিম অনুভূতিকে আহত করেছে, সেই আধুনিক যুগের চাইতে হিজরীর প্রথম শতাব্দীসমূহে এই সহনশীলতা অধিক পরিমাণে কার্যকরী ছিল। আলেমগণের চাইতে সাধারণত বেসামরিক সরকারকে অধিকতর সহনশীলরূপে দেখা গেছে এবং শাস্ত্রবিদগণের অভিমত অক্ষরে অক্ষরে খুব কমই কার্যকরী করা হয়েছে। যদিও স্থান-কালভেদে কর্মপন্থার পার্থক্য দেখা গেছে, তবুও অসহনশীলতার কোন সুনির্দিষ্ট নীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত না হয়ে বরং স্থানীয় ও বিশেষ পরিস্থিতির পরিণতিস্বরূপই উৎপীড়ন সংঘটিত হয়েছে। এ. দ্য. গীবনোর (A. de Gobineau) অভিমত মোটামুটিভাবে ঐতিহাসিক তথ্য দ্বারা সমর্থিত :

"যেমন অনেক সময় বলা হয়েছে, তেমনি কেউ যদি ধর্মীয় নীতিকে রাজনৈতিক স্বার্থ থেকে পৃথক করে দেখতে চায়, তবে ইসলামের চাইতে অধিক সহনশীল এবং মানুষের স্বাধীন বিশ্বাস সম্পর্কে অধিকতর উদার দৃষ্টিসম্পন্ন কোন ধর্ম পাওয়া যাবে না। এই অন্তর্নিহিত নীতি এত শক্তিশালী যে, যেসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার খাতিরে বিশ্বাসের ঐক্য অক্ষুণ্ন রাখতে সর্বপায়ে চেষ্টা করা হয়েছে, সেসব ক্ষেত্র ব্যতিরেকে অন্যান্য সব সময় পূর্ণতম সহনশীলতা প্রদর্শনই এই আদর্শের দাবি।... ... সুযোগ আসামাত্রই হিংসাপরায়ণতা বা নৃশংসতা প্রদর্শনের অবকাশ এতে নেই। এই সত্যটি যিনি হৃদয়ংগম করবেন তার বুঝতে বিলম্ব হবে না যে, ইতিহাসের কোন কোন পর্যায়ে অসহিষ্ণু গোঁড়ামীর যে তাণ্ডব লক্ষ্য করা গেছে তার মূলে ছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণ বা মানবীয় কুপ্রবৃত্তির তাড়না। ধর্মকে সেখানে নেহায়েতই মতলব হাসিলের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে, আসলে ধর্মীয় নীতির সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক ছিল না।"[৪]

ঐতিহাসিকের এই নৈর্ব্যক্তিক উপসংহারের সাথে যোগ করা যেতে পারে, ১৬১০ সালে স্পেন থেকে মূরদের সর্বশেষ নির্বাসনকালে নিজ জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত জনৈক স্পেনীয় মুসলমানের আবেগ-মিশ্রিত ফরিয়াদ :

---

১. Ib. I : 266; J. Scheffler : Turchken-Schrifft, 1664 & 45T; T. Gastowit, La Pylogue et l' Islam, Paris, 1907, P. 51.
২. Sechetfler, 84.
৩. La Jonquire, II 482.
৪. Ses Religious et les philosophies dans l'Asie Centrale, Paris, 1865, p. 24.

"যখন খৃষ্টধর্মকে স্পেন থেকে উৎখাত করে দেবার শক্তি আমাদের বিজয়ী পূর্বপুরুষদের ছিল। তখন তাঁরা কি ভুলেও কখনো সেরূপ চেষ্টা করেছেন? তোমাদের পূর্বপুরুষরা যখন পরাধীন ছিল, তখন তাদের স্বীয় ধর্মানুষ্ঠানের অবাধ অধিকার কি তাঁরা দেন নি? আমাদের রাসূল (সা)-এর কঠোর নির্দেশ কি এরূপ নয় যে, যেদেশই মুসলমানগণ জয় করুক না কেন, একটা স্বাভাবিক বার্ষিক রাজস্ব প্রদানের বিনিময়ে তাদের আদিম ধর্মানুষ্ঠান, তা যত অদ্ভুত হোক না কেন, অথবা যে কোন ধর্মবিশ্বাস প্রতিপালন ও অনুসরণের অনুমতি তারা পাবে। বলপ্রয়োগে ধর্মান্তরিতকরণের দু'একটা দৃষ্টান্ত যদিও বা পাওয়া যায়, তা সংখ্যায় এত স্বল্প ও দুর্লভ যে, তা উল্লেখের যোগ্যতা রাখে না এবং এগুলো শুধু সেসব ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হয়েছে, যাদের অন্তরে আল্লাহ-ভীতি বা রাসূল (সা)-এর দৃষ্টান্ত স্থান পায় নি এবং এরূপ করে তারা প্রত্যক্ষ ও খাড়াখাড়িভাবে ইসলামের পবিত্র আদর্শ ও নীতির বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। কারণ, মুসলিম নামের মর্যাদা লাভের যোগ্য কোন ব্যক্তি কোন খোশখেয়ালের বশবর্তী হয়ে এই সুমহান নীতি ভঙ্গ করতে পারেন না।

ধর্মীয় পার্থক্যের কারণে নৃশংস বিচারকের ভূমিকা গ্রহণ করেছে এমন কোন দৃষ্টান্ত তোমরা আমাদের মধ্যে দেখাতে পাবে না। একথা সত্য যে, যারাই আমাদের ধর্ম গ্রহণ করতে ইচ্ছুক তাদের দিকে আমাদের হাত আমরা বাড়িয়ে দিই; কিন্তু পাক কুরআনুল-করীম কখনো আমাদেরকে কারো বিবেকের উপর যুলুম করবার অনুমতি দেয় না। ইসলামে দীক্ষা গ্রহণকারীগণ স্বাভাবিকভাবেই আমাদের উৎসাহ লাভ করে এবং আল্লাহ্‌র একত্ব ও রাসূল (সা)-এর রিসালাত স্বীকার করে নেবার পরই তারা বিনা বাধায় আমাদের একজন হয়ে যায়। আমাদের কন্যা তারা স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে এবং বিশ্বাস, মর্যাদা ও উপার্জনের পদে অধিষ্ঠিত হয়। আমরাও এতটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকি যে, তারা আমাদের প্রথাদি গ্রহণ করে এবং অন্তত বাহ্যত খাঁটি বিশ্বাসীরূপে আচরণ করে এবং যতদিন তারা আমাদের ধর্মের প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ না করে, আমরা কখনও তাদের বিবেক পরীক্ষার কথা চিন্তা করি না। তারা প্রকাশ্যে বিরুদ্ধাচরণ করলে আমরা অবশ্যই তাদেরকে যথাযোগ্য শাস্তিদান করি। কারণ তাদের ধর্মান্তরিতকরণ হয়েছিল স্বেচ্ছায়, বলপ্রয়োগে নয়।"[১]

---

১. J. Morgan : Mahometism Explained, London, 1723-25, II : 297 f. 345